মাইকেল মধুসূদন দত্তের

প্র·হ·স·ন

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

একেই কি বলে সভ্যতা?

আলোকিত মানুষ চাই

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
প্রহসন

বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ
একেই কি বলে সভ্যতা

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

ষষ্ঠ সংস্করণ সপ্তম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৯ নভেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0003-9

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) বাংলাসাহিত্য সাধনা শুরু করেছেন নাটক রচনা দিয়ে আর তাঁর শেষ রচনাও নাটক।

কিন্তু মধুসূদন প্রধানত কবি। আমাদের সমগ্র অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাঁর অবিস্মরণীয় কাব্য প্রতিভার প্রতি। তিনি বাংলা কাব্যধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অসামান্য সমন্বয় সাধন করেছেন, বাংলা কাব্যকে মধ্যযুগীয় ধারণা থেকে এককভাবে আধুনিক নবজীবনের সুধা ও সৌরভ দান করেছেন।

কবি মধুসূদন যা করেছেন তার যেমন পরিমাপ নেই, তেমনি নাট্যকার মধুসূদন যা করে রেখেছেন তার জন্য বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের সম্ভাবনা এবং সীমানার অবয়ব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে।

যে অলীক কুনাট্যরঙ্গে রাঢ়বঙ্গের মানুষ এতদিন মজেছিল তারা মধুসূদনের নাট্য প্রতিভার উপাচার পেয়ে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় নাটকের চমৎকার সমন্বিত শক্তিকে উপলব্ধি করল। ভারতের কালিদাসের নাট্য উপাদান এবং ইউরোপের শেক্সপিয়রীয় নাট্য প্রকরণ যুগপৎ তাঁর নাট্যকর্মের মধ্যে মিলিত হল। বাংলা নাটকের হীন, দুর্বল ও অবাঞ্ছিত রূপের গ্লানি দূর হল।—মধুসূদন প্রকৃত মধুসূদন রূপে বাংলা কাব্য এবং নাট্যকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করলেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬১ সাল, মাত্র চার বছরে মধুসূদন নাটক লিখেছেন তিনটি এবং প্রহসন দু'খানি।

মধুসূদনের সাহিত্যের ত্বরিত উদ্বোধন ও যৌবন এ সময়টা।

অমিতচারী মধুসূদনের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এই স্বল্পকালে, অতি দ্রুত উল্কার গতিবেগের মতো। কবির সময় নেই। অতি শীঘ্র কর্ম সম্পাদন করে তিনি চলে যাবেন তাঁর প্রিয় কবি মিল্টনের দেশে। তাঁর স্বপ্নের রাজ্যে অভিযাত্রার পূর্বে কবি দু'হাত উজাড় করে বাংলা কাব্য ও রঙ্গমঞ্চকে ঢেলে দিয়ে গেলেন—যা কিছু তাঁর দেওয়ার আছে।

শর্মিষ্ঠা মহাভারতের পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। শর্মিষ্ঠা মহাভারতের কাহিনীনির্ভর, পদ্মাবতী গ্রিক পুরাণ অনুসারে ভারতীয় রূপান্তর আর কৃষ্ণকুমারী ইতিহাস অবলম্বিত বাংলাসাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি—কেবল প্রথম নয়, এখন পর্যন্ত এক অনন্য বিষাদময় নাট্যসৃজন।

নাটকে মধুসূদনের প্রধান সহায় হল গদ্য। বাংলা গদ্যের সেই অমসৃণ, অসংগঠিত কালে মধুসূদন তাকেই পুরাণ, রূপকল্পলোক ও ট্র্যাজেডির গভীরতম গাঢ়তাকে বিকাশ করার জন্য ব্যবহার করলেন। সর্বতো সাফল্য তাতে আসেনি, সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের অবিমিশ্র ব্যবহারে বাংলা গদ্য তাতে মুক্তি পায়নি, বিষয় এবং ভাবনার উদার মুক্তি আসেনি। কিন্তু মধুসূদন বাংলা গদ্যের লোকজ ও প্রাকৃত রূপের ব্যবহার দিয়ে তাঁর দু'খানি প্রহসনকে একেবারে মাতিয়ে রেখে গেলেন।

মধুসূদন আমাদের কাব্যের এক কালাপাহাড়ি শক্তি। এ ভূখণ্ডের পুরাণ, এ জনপদের নিষ্কম্প্র বিশ্বাস এবং কাব্যের পয়ার গতানুগতিকতার মধ্যে তিনি নবচেতনার আলো, মানবের ভাগ্য জয়ের অধিকার এবং পুরুষকারের শক্তিকে আবাহন করলেন।—আমাদের আকাশ বিস্তৃত হল। আমাদের বোধের জমিন প্রসারিত হল, আমাদের কাব্যের বদ্ধ ক্ষেত্র উচ্ছলিত হল। মাত্র দুখানি স্বল্পায়তন প্রহসনে মধুসূদন অসামান্য অবিস্মরণীয় কাজ করলেন :

১. প্রহসনের আঙ্গিক দৃঢ়ভাবে সংগঠন—
২. সমসাময়িক সমাজাচরণকে স্পষ্টীকরণ—
৩. মুখের ভাষাকে চরিত্রের সংলাপরূপে সংযোজন—
৪. নিহত গোপন দুর্বৃত্তিকে উন্মোচন—

একেই কি বলে সভ্যতা এবং *বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ* তাঁর দুই প্রহসন। আয়তনে স্বল্প, দু'খানিই দু'অঙ্কের এবং প্রত্যেকেই দুই-দুই চার দৃশ্যের।—কিন্তু প্রহসন দু'খানির মধ্যে যে রসময় তীক্ষ্ণতা ও স্বভাবগুণের নির্মল প্রকাশ আছে, তা উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ প্রহসনে পাওয়া যাবে না।

উনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ সময়ের তিনটি দশক রাজধানী কলকাতা এবং বঙ্গদেশের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা প্রভূতভাবে সেকালের বিবিধ প্রহসনে উপস্থাপিত হয়ে আছে। বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, ইংরেজি শিক্ষা, মদপান, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, মোহন্তের অনাচার ইত্যাদি শত প্রকার বিষয় প্রহসনের উপাদান হয়েছে। কিন্তু সবকিছুর মূলেই মধুসূদনের এ-দু'খানি প্রহসনের অব্যর্থ অনুসরণ ও অবলম্বন বিদ্যমান।

মধুসূদন এক সংস্কারমুক্ত আধুনিক মানুষ। কিন্তু তিনি সর্বোপরি একজন বাঙালি। যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের পরিমণ্ডলে মা জাহ্নবীর কোলে বসে আবাল্য রামায়ণ মহাভারত পড়া বালক তিনি।

নিজ ভূখণ্ডের সঙ্গে স্মৃতিসুখময় সংলগ্নতা তাঁর ছিল আমৃত্যু। আর আধুনিক নগরী কলকাতার উঠতি জীবনের সঙ্গে তাঁর হয়েছে নবীন যৌবনের যোগাযোগ।

একেই কি বলে সভ্যতা সেই নবীন কলকাতার নবীনতম যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের এক রসময় উজ্জ্বল রেখাচিত্র। আধুনিকতার নামে, সংস্কার বিরোধের নামে এক-এক করে অনাচার এসে নবীন যুবকদের কীভাবে জীবনচ্যুত ও আদর্শচ্যুত করছে তার সরস ও রঙ্গময় চিত্র—*একেই কি বলে সভ্যতা*।

নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস, আলালের ঘরের দুলাল এবং ঈশ্বরগুপ্তের সমসাময়িক গদ্যে আমরা যে চিত্রগুলো খণ্ড-খণ্ডভাবে পেয়েছি তারই সংহত এবং সরসরূপ—একেই কি বলে সভ্যতা। এই প্রহসনখানির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে দীনবন্ধু মিত্র এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসনে।

কলকতা শহরের তৎকালীন লৌকিক ভাষার একটি নমুনা একেই কি বলে সভ্যতা থেকে—

নব ॥ হোয়াট? তুমি আমাকে লায়ার বল? তুমি জানো না,—আমি তোমাকে এখনি শুট করব।

চৈতন ॥ হাঁ, যেতে দাও, যেতে দাও। একটা ট্রাইফ্লিং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন?

নব ॥ ট্রাইফ্লিং? ও আমাকে লায়ার বললে, আবার ট্রাইফ্লিং? ও আমাকে বাংলা করে বললে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন? তাতে কোন শালা রাগত? কিন্তু লায়ার—একি বরদাস্ত হয়?

এ প্রহসনখানি লেখার শুরু ১৮৫৯ সালে। প্রকাশিত হয় ১৮৬০-এ। বেলগাছিয়া থিয়েটারে এ প্রহসন মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি।

মধুসূদন দত্তের নাটকের নির্দেশক ও অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় বলেছেন—ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে কতিপয় যুবক পূর্বাহ্নেই জেনে গেলেন যে, একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসনখানিতে তাদের আচরণ বিশেষ প্রকটভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেজন্য তারা ক্ষুব্ধ হয়ে হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন এবং যেন এ নাট্যখানি কোনোরূপে মঞ্চস্থ না হয় সেজন্য রাজাদের (ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ) ওপর প্রভাব বিস্তার করলেন।

রাজামহোদয়গণ প্রথমে এরূপ অনুরোধে স্বীকৃত হননি; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা এ প্রহসনখানি মঞ্চে আনয়ন রহিত করেন। এই সময়ে মধুসূদনের অন্য প্রহসন বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ লিখিত এবং একই বছর প্রকাশিত হল।

এ প্রহসনখানিও মঞ্চস্থ হল না প্রায় একই কারণে। যদিও প্রহসনখানি কলকাতা নগরভিত্তিক বিষয়ানুসারী নয়। এর বিষয় যশোহর জেলার কোনো গ্রাম এবং সে গ্রামের জমিদার ও রায়তের প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রহসনখানিতে এক কপট দুরাচারী ধর্মকুঞ্চকাবৃত বৃদ্ধের গোপন লাম্পট্যের সরস উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে।

ভক্তপ্রসাদ জমিদার। তিনি সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত আহ্নিক করেন। ছেলে কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে সনাতন ধর্ম বিস্মৃত হচ্ছে শঙ্কায় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কিন্তু যুবতী বালিকা সন্দর্শনেই ভক্তপ্রসাদের মধ্যে ভোগ-লালসা উদ্‌গত হয়। তিনি যেমনই কৃপণ তেমনি নিষ্ঠুর। গরিব রায়ত হানিফকে খাজনা মওকুফ করতে মোটেই স্বীকৃত নন কিন্তু যেইমাত্র শোনেন হানিফের নববিবাহিতা উনিশ-কুড়ি বছরের বউ ফতেমা অসাধারণ সুন্দরী ও ভোগযোগ্য—সে মুহূর্তে তিনি কামজ্বরে উদ্দীপ্ত হয়ে হানিফকে খাজনা মাফ করে দেন।

ভক্তপ্রসাদ মাথায় তাজ পরে এবং গায়ে আতর মেখে পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধভরা মুসলমান যুবতীর সঙ্গে গোপনে মিলিত হওয়ার জন্য এগোচ্ছেন—তখনো তাঁর কণ্ঠে ঈশ্বরের নাম। ধার্মিক বটে ভক্তপ্রসাদ! ভগ্ন শিবমন্দির প্রাঙ্গণে লম্পট ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে সতী এবং সাহসী ফতেমার সাক্ষাৎ হল। কিন্তু ভক্তপ্রসাদ তখন ষড়যন্ত্রের জালে বন্দি। প্রচুর প্রহার ও লাঞ্ছনা ভোগের পর এবং হানিফকে দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে তবে তিনি লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

মধুসূদনের এ প্রহসনখানি সর্বতোভাবে সুসংগঠিত এবং ভাষা প্রয়োগের ফলে অতি উৎকৃষ্ট রচনা। এমন সংকোচহীন, সংহত, উদার এবং সরস প্রহসন সমগ্র বাংলাসাহিত্যেই বিরল। খাঁটি বাংলাসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ মধুসূদনের এই দুইখানি প্রহসন।

বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ দুই অঙ্কের চার দৃশ্যের প্রহসন। এই স্বল্পায়তন প্রহসনখানিও বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল না। হিন্দু সমাজের ভণ্ডামি ও কপটতাকে আক্রমণ করে মধুসূদন প্রাচীনদেরও বিক্ষুব্ধ করলেন। পাইকপাড়ার জমিদাররা সিদ্ধান্ত নিলেন, এ প্রহসনখানিও তাঁদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে না। মধুসূদনের কাব্য-মহিমা ও শক্তির সঙ্গে তাঁর গদ্যরচনার তুলনা হয় না। তবে লোকজ

ও প্রাকৃত গদ্য এবং প্রচলিত মুখের ভাষাকে প্রহসনের সংলাপ করে মধুসূদন আমাদের সাহিত্যকে অসামান্য শক্তি দান করেছেন।

এ রীতি রাম রাম বসুর লিপিমালা, ভবানীচরণের নববাবু বিলাস, প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলালে অনুসৃত হয়েছে কিন্তু নাটকের জীবন-ধর্মকে তার কালের প্রবাহের মধ্যে ধরে রাখার জন্য মুখের ভাষা এমন সহজ ও নির্লিপ্ত সততার সঙ্গে ব্যবহার করা সহজ কাজ নয়। মধুসূদন সেই কাজটি সহজেই করেছেন। আর তাঁর পথ অনুসরণ করেই দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণের তোরাপ ও ক্ষেত্রমণিকে এমন বাস্তবভাবে প্রকটিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে মুসলমান রায়ত হানিফের সংলাপ—

> হানিফ ॥ এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দু'জন আছে। শালা রাইয়ত বেচারিগো জানে মারে, তাগোর সব লুটে লিয়ে তারপর এই করে। আচ্ছা দেখি এই কুম্পানির মুলুকে এনছান আছে কি না বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে ছাড়ব।

মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন দু'খানি আমাদের মঞ্চ ও পাঠের জন্য অতীব মূল্যবান সম্পদ। এ দু'খানি প্রহসন নিজের কালকে বিধৃত করেও কালের সীমানা ডিঙিয়ে একালে এসে সমভাবে তীক্ষ্ণতা ও রঙ্গময়তা বিতরণ করছে। এমন সৃজন বাংলাসাহিত্যে বড় সুলভ নয়।

মধুসূদন বাংলা নাটকের ট্র্যাজেডি ও প্রহসন রচনা উভয় পথের নির্দেশক হয়ে আছেন। কেবল নির্দেশক মাত্র নন তিনি, সর্বতোভাবে সফলতার গৌরবও তাঁর প্রাপ্য।

মমতাজউদদীন আহমদ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ

পুরুষ-চরিত্র	স্ত্রী-চরিত্র
ভক্তপ্রসাদ বাবু	পুঁটি
পঞ্চানন বাচস্পতি	ফতেমা (হানিফের পত্নী)
আনন্দ বাবু	ভগী
গদাধর	পঞ্চী
হানিফ গাজী	
রাম	

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা
গদাধর এবং হানিফ গাজীর প্রবেশ

হানি : (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বলব কী। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠল না। দশ ছালা ধানও বাড়ি আনতি পাললাম না—খোদাতালার মর্জি!

গদা : বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ এখন কত্তাবাবু কী করেন।

হানি : আর কী করবেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা : তবে তুই কী করবি?

হানি : আর মোর মাথা করব! এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হল!

গদা : এই যে কত্তাবাবু এদিকে আসচেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই-এক কথা বলতে কসুর করব্যো না। দেখ কী হয়!

(ভক্তবাবুর প্রবেশ)

হানি : কত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত : (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হানফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত। তুই খাজনা দিস নে কেন রে, বল তো? (মালা জপন)

হানি : আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ হয়েচেন।

ভক্ত : তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল!

হানি : আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা—

ভক্ত : মর বেটা, কোম্পানির সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল—খাজনা দিবি কি না।

হানি : কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার ওপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাব কনে। আমি এখনে বারোটি গণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত : তুই বেটা তো কম বজ্জাত নস রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস। গদা—

গদা : আজ্ঞে এএএ।

ভক্ত : এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।

গদা : যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল রে।

হানি : কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাব কনে?

ভক্ত : নে যা না—আবার দাঁড়াস কেন?

গদা : চল না।

হানি : দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমিদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দু'এট্টা কথা বল না কেন?

গদা : আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

ভক্ত : কী রে—

গদা : আপনি হানফেকে এবারকার মতন মাফ করুন।

ভক্ত : কেন?

গদা : ও বেটা এবার যে ছুঁড়িকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত : না।

গদা : মশায়, তার রূপের কথা আর কী বলব। বয়স বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোনা।

ভক্ত : (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস কী রে?

গদা : আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বলচি? আপনি তাকে দেখতে চান তো বলুন।

ভক্ত : (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগিদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভকভক করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা : কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত : (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করব?

গদা : মশায়, মুসলমান হল তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।

ভক্ত : দীনবন্ধু, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কী? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে; —বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? আচ্ছা ডাক, হানফেকে ডাক।

গদা : ও হানিফ, এদিকে আয়।

হানি : অ্যাঁ, কী?

ভক্ত : ভালো, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদবাকি টাকা কবে দিবি বল দেখি?

হানি : কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারব।

ভক্ত : আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ানজীকে দে গে।

হানি : (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচলাম! বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম। (প্রকাশে) সালাম কত্তা—

[প্রস্থান]

ভক্ত : ওরে গদা—

গদা : আজ্ঞে এএএ।

ভক্ত : এ ছুঁড়িকে তো হাত কত্যে পারবি?

গদা : আজ্ঞে, তার ভাবনা কী? গোটা কুড়িক টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত : কু-ড়ি-টা-কা! বলিস কী!

গদা : আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ি বউমানুষ কিনা।

ভক্ত : আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাব তখন আসিস, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা : যে আজ্ঞে।

ভক্ত : (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে? বাচস্পতি না?

(বাচস্পতির প্রবেশ)

কে ও? বাচস্পতি দাদা যে। প্রণাম। এ কী?

বাচ : আর দুঃখের কথা কী বলব, এত দিনের পর মা ঠাকুরুনের পরলোক হয়েছে। (রোদন)

ভক্ত : বল কী? তা এ কবে হল?

বাচ : অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত : হয়েছিল কী?

বাচ : এমন কিছু নয়, তবে কিনা বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত : প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ : তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত : আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ : না, সে তো গিয়েইছে—'গতস্য শোচনা নাস্তি'—সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কিনা আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় থেকে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত : আমার ভাই এ নিতান্ত কু-সময়, অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে।

বাচ : আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মতো সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত : আমি যে এ-সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোনোমতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ : বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত : প্রণাম—

[বাচস্পতির প্রস্থান]

আহ, এই বেটারাই আমাকে দেখছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও বৈ আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা : আজ্ঞে এএ।

ভক্ত : ছুঁড়ি দেখতে খুব ভালো তো রে।

গদা : কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো!

ভক্ত : কোন ইচ্ছে?

গদা : আজ্ঞে, ঐ যে ভটচাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত : হাঁ! হাঁ! ছুঁড়িটে দেখতে ছিল ভালো বটে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কী হয়েছে রে?

গদা : আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হানফের মাগ তার চাইতেও দেখতে ভালো।

ভক্ত : বলিস কী! অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিকঠাক কত্যে পারবি তো?

গদা : আজ্ঞে, আজ না-হয় কাল-পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত : দেখ, টাকার ভয় করিস না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা : যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি—গো-মড়কেই মুচির পার্বণ।

ভক্ত : (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা : আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আনতে আসচে।

ভক্ত : কোন ভগী রে?

গদা : আজ্ঞে, পীতেম্বরের তেলীর মাগ।

ভক্ত : ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা : আজ্ঞে, ও আজ দু'দিন হল শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে।

ভক্ত : (স্বগত) 'মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।'[২] আহা! 'কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥'[২]

গদা : (স্বগত) আবার ভাব লাগল দেখচি। বুড়ো হলে লোভাত্তি হয়; কোনো ভালোমন্দ জিনিস সামনে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত : ওরে গদা—

গদা : আজ্ঞেএএ।

ভক্ত : এদিকে কিছু কত্যে টত্যে পারিস?

গদা : আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

(কলসি লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ)

ভক্ত : ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী : সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিনতে পারেন না?

ভক্ত : এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা, ভালো ভালো, মেয়েটি বেঁচে থাকুক। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী : আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ি।

ভক্ত : হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী : (সগর্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখতে বড় ভালো। আর কলকেতায় থেকে লেখাপড়া শেখে। শুনেছি যে লাটসাহেব তারে নাকি বড় ভালোবাসেন, আর বছর বছর এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত : তবে জামাইটি কলকেতাতেই থাকে বটে?

ভগী : আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কী বলব। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত : হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ির নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারব। (প্রকাশে) ও পাঁচি,

একবার নিকটে আয় তো, তোকে ভালো করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেচিস।

ভগী : যা না মা, ভয় কী? কত্তাবাবুকে দিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী : (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড়ো মিনসে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় নাকি? ও মা, ছিঃ! ও কী গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর।

ভক্ত : (স্বগত) 'শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।' আ-হা-হা!

ভগী : আপনি কী বলছেন?

ভক্ত : না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাকবে?

ভগী : ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত : (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারব না? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী : কত্তাবাবু! আপনি কী বলছেন?

ভক্ত : বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী : সে নুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত : আসবে কবে?

ভগী : আজ্ঞে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে আসবে বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই।

ভক্ত : হাঁ, এসো গে।

ভগী : আয় মা, আয়। [ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান]

ভক্ত : (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতে আসতে এ কর্মটা সারতে পারলে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ি কী সুন্দরী! কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা : আজ্ঞে! (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখচি।

ভক্ত : কাছে আয় না। দেখ, এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস?

গদা : কত্তামশায়! এ আমার কর্ম নয়। তবে যদি আমার পিসি পারে তা বলতে পারি নে।

ভক্ত : তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসিকে এসব কথা বলগে। আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেব।

গদা : যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে করিতে) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কী ফলে। [প্রস্থান]

ভক্ত : (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ির কী চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কী হয়।

(চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ)

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হল। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধু! তুমিই যা কর। আহ্, এ ছুঁড়িকে যদি হাত কত্যে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ গাজীর নিকেতন-সম্মুখ
হানিফ এবং ফতেমার প্রবেশ

হানি : বলিস কী! পঞ্চাশ টাকা?

ফতে : মুই কি আর ঝুঁট কথা বলছি।

হানি : (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে[৩] আর দু'জন আছে? শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মার্যে, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তারপর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ[৪] আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়ব। বেটার এত বড় মকদুর[৫]। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেল কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরি করেছে আর মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি[৬] করেনি। শালা—

ফতে : আরে মিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগিকে মোর কাছে পেটয়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেচে।

হানি : গস্তানীর মাথাটা ভাঙতি পাত্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে : চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগি আস্যে কী করে। [উভয়ের প্রস্থান]

(পুঁটির প্রবেশ)

পুঁটি : (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু। পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়িতেও আসতে গা বমি-বমি করে। থু, থু। কুঁকড়র পাখা, প্যাঁজের খোসা। থু, থু। তা করি কী? ভক্তবাবু কি এ কর্মে কখনো ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়ো, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি—এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার ঠিকানা নাই। (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান—ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মরি, কী নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক মেনে, দেখি এখন এ মাগিকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয় পায়! সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে, দুই-চার টাকা দেখলে নেচে উঠবে। আর ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাকত তা হলেও ক্ষতি ছিল না। ছুঁড়ি যদি নারাজ হয়ে রাগত তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কী হয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ি আছিস?

নেপথ্যে : ও কে ও?

পুঁটি : আমি, একবার বেরো তো।

(ফতেমার প্রবেশ)

ফতে : পুঁটি দিদি যে, কী খবর?

পুঁটি : হানিফ কোথায়?

ফতে : সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি : (স্বগত) আপদ গেছে। মিনসে যেন যমের দূত। (প্রকাশে) ও ফতি, তুই এখন বলিস কী ভাই?

ফতে : কী বলব?

পুঁটি : আর কী বলবি? সোনার খাবি, সোনার পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাকবি?

ফতে : তা ভাই যার যেমন নসিব[৭]। তুই মোকে জওয়ান[৮] খসম[৯] ছেড়ে একটা বুড়োর কাছে যাতি বলিস, তা সে বুড়ো মলি ভাই আমার কী হবে?

পুঁটি : আহ্! ওসব কপালের কথা, ওসব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ম করিস তো বল, টাকা—দি; আর না করিস তো তাও বল, আমি চললেম।

ফতে : দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি : তুই যদি আমার কথা শুনিস তবে তোর আর দেরি করে কাজ নেই।

ফতে : (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটি : দেখিস ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে : তার জন্যে ভয় কী? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়িতে যাব এখন। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম[১০] কত্যি পারবে না?

পুঁটি : কী সর্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ-কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস।

ফতে : (সহাস্য বদনে) মোরা রাঁড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই কী করিস বল দেখি। সে যা হৌক মেনে[১১], এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি : এই নে।

ফতে : (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হল।

পুঁটি : ছ' টাকা ভাই আমার দস্তুরি।

ফতে : না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু' টাকা নে।

পুঁটি : না ভাই, আমাকে নাহয় চারটে টাকা দে।

ফতে : আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি : এই নে—আর দেখ, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব-বাগানে যাস, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাব।

ফতে : আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি : দেখ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চললেম। [প্রস্থান]

(হানিফের পুনঃপ্রবেশ)

হানি : (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত মাত্যি চায়। দেখিস ফতি, যা কয়ে দিচ্ছি, যেন ইয়াদ[১২] থাকে, আর তুই সমঝে[১৩] চলিস; বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত না দিতি পায়।

ফতে : তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আসতেচে, আমি পালাই। [প্রস্থান]

(বাচস্পতির প্রবেশ)

বাচ : (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেঁতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণ-পথারূঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক, ওসব

কথা আর এখন ভাবলে কী হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী—

হানি : আগ্যে, কী বলচ?

বাচ : ওরে দেখ, একটা তেঁতুলগাছ কাটতে হবে, তা তুই পারবি?

হানি : পারব না কেন?

বাচ : তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি : ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কী দেছে গা?

বাচ : আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে, এখন আমার বড় কু-সময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে!

হানি : (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আস তো, তোমার সাথে মোর থোড়া[১৪] বাৎ চিত[১৫] আছে।

বাচ : কী বাৎ চিত, এখানেই বল না কেন?

হানি : আগ্যে না, একবার ঐদিকে যাতি হবে।

বাচ : তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

(ফতেমা এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ)

পুঁটি : না ভাই, ও আঁব-বাগানে হল না।

ফতে : তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস তা বল?

পুঁটি : দেখ, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত চার ঘড়ির সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয় করে কম্মে দেব।

ফতে : আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস ভাই এ-কথা যেন কেউ টেরটোর না পায়।

পুঁটি : ওলো, তুই কি কায়েত না বামনের মেয়ে যে তোর এত ভয় লো?

ফতে : আমি যা হই ভাই, আমার আদমি[১৬] এ-কথা টের পাল্যি আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি : (সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উহ্! বেটা যেন ঠিক যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান]

ফতে : (স্বগত) দেখি, আজ রাতির বেলা কী তামাশা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান]

(বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ)

বাচ : শিব! শিব! এ বয়সেও এত? আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ, দেখ, যে-কথা বল্যেম তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস। এতে দেখছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি : য্যাগ্যে, তার জন্যি ভাবতি হবে না।

বাচ : এখন চল। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি : কুরুলখানা বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদবাবুর বৈটকখানা
ভক্তবাবু আসীন

ভক্ত : (স্বগত) আহ্! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধু! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পক্ষী ছুঁড়িকে পাওয়া দুষ্কর, কী দুঃখের বিষয়! এমন কনক-পদ্মটি তুলতে পাললেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্য়ে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার[১৭] হস্তে পরাভূত হল্যেন। যা হৌক, এখন যে হানফের মাগটাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ি দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে, যৌবনে কুকুরীও ধন্য! (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই-তিন দণ্ড বেলা আছে। কী উৎপাত!

(আনন্দবাবুর প্রবেশ)

কে ও, আনন্দ নাকি? এস বাপু এস, বাড়ি এসেছ কবে?

আন : (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত : তবে[১৮] কী সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন : আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেকদিন বাড়ি আসা হয়নি বল্যে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত : তা বেশ করেছ। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন : আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কলকেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত : কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আন : আজ্ঞে, থাকতেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি!

ভক্ত : অম্বিকার লেখাপড়া হচ্যে কেমন?

আন : জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর ছোকরা তো হিন্দু কালেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত : এমন কী ছোকরা বললে, বাপু?

আন : আজ্ঞে, ক্লেবর, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত : হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজি কথা বটে? ও সকল, বাপু, আমাদের কানে ভালো লাগে না। জহীন কিম্বা চালাক বললে আমরা বুঝতে পারি। ভালো, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোনো অধর্মাচরণ শিখছে না।

আন : আজ্ঞে, অধর্মাচরণ কী?

ভক্ত : এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রিস্টিয়ানি মত—

আন : আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বলতে পারি না।

ভক্ত : আমার বোধহয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি-না। প্রভো! তুমিই সত্য! ভালো, আমি শুনেছি যে, কলকেতায় নাকি সব

একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোনারবেনে, কপালী, তাঁতি, জোলা, তেলী, কলু, সকলই নাকি একত্রে ওঠে বসে, আর খাওয়াদাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন : আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।

ভক্ত : কী সর্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখচি আর কোনো প্রকারেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন-দিন বাড়ছে বৈ তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

(গদাধরের প্রবেশ)

কে ও?

গদা : আজ্ঞে, আমি গদা। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

ভক্ত : (ইশারা)

গদা : (ঐ)

ভক্ত : (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না নাকি। (প্রকাশে) ভালো, আনন্দ! শুনেছি—কলকেতায় নাকি বড় বড় হিন্দুসকল মুসলমান বাবুর্চি রাখে?

আন : আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত : থু! থু! বল কী? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম! থু! থু।

গদা : (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাহ্! বাহ্! কত্তাবাবুর কী বুদ্ধি!

ভক্ত : অম্বিকাকে দেখচি আর বিস্তর দিন কলকেতায় রাখা হবে না।

আন : আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোনোমতেই উচিত হয় না।

ভক্ত : বল কী বাপু? এর পরে কি ইংরাজি শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে? আর 'মরা গরুতেও কি ঘাস খায়' এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে?

নেপথ্যে। (শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, ইত্যাদি)

ভক্ত : এস, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন : যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

গদা : (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেল। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন) বাহ্! কী নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুমঘুম কত্যে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম।

নেপথ্যে : কে ও?

গদা : আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অম্বুরী তামাক-টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস, খাওয়াচ্যি।

গদা : (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কী আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুধ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাদের কত্যে সুখী কি আর আছে?

(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ)

রাম : ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস?

গদা : একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, হুঁকোটা দে। কত্তাবাবুর ফরসিটে আনতিস তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ)

রাম : হা ! হা ! হা ! তুই বাবুদের মতন তামাক খেতে কোথায় শিখলি রে? এ যে ছাতারের নেত্য ! হা ! হা ! হা !

গদা : হা ! হা ! হা ! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ তো।

রাম : মর শালা, আমি কি তোর চাকর? হা ! হা ! হা !

গদা : তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম : হা ! হা ! হা ! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা : রোস, হুঁকোটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম : (গাত্র টেপন।)

গদা : হা ! হা ! হা ! মর, অমন করে কি টিপতে হয়?

রাম : কেমন, এখন ভালো লাগে তো ! হা ! হা ! হা !

গদা : আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম, হা ! হা ! হা !

রাম : (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা, ঐ দেখ কত্তাবাবু আসচে।

[হুঁকা লইয়া হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান]

গদা : (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড়ো বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ইস্ ! আজ বুড়োর ঠাট দেখলে হাসি পায় ! শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদর, জরিরজুতো, আবার মাথায় তাজ। হা ! হা ! হা !

(ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ)

ভক্ত : ও গদা।

গদা : আজ্ঞে এএএ।

ভক্ত : ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা : আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাকতে পারবে, আপনি আসুন।

ভক্ত : যা, তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা : যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

ভক্ত : (স্বগত) এই তাজটা মাথায় দেওয়া ভালোই হয়েছে। নেড়ে মাগিরা এই সকল ভালোবাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত : আমার হাতবাক্সটা আর আরশিখানা আন তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবালবৃদ্ধবনিতা আতরের খোসবু[১৯] বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কী জানি যদি মাগির গায়ে প্যাঁজের গন্ধটন্ধ থাকে, নাহয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর করব।

(বাক্স ও আরশি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ)

ভক্ত : (আরশিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ, যদি কেউ আসে তো বলিস যে আমি এখন জপে আছি।

রাম : যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

ভক্ত : (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহ্ ! গদা বেটা যে এখনও আসচে না? বেটা কুড়ের শেষ।

[গদার পুনঃপ্রবেশ]

কী হল রে?

গদা : আজ্ঞে, পিসি তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত : তবে চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির
বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ

বাচ : ও হানিফ!

হানি : জি।

বাচ : এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখছি কেউ আসেনি। তা চল, আমরা ঐ অশ্বত্থ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি : আপনার যেমন মরজি।

বাচ : কিন্তু দেখ, আমি যতক্ষণ না ইশারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস।

হানি : ঠাহুর, তা তো থাকপো; লেকিন[২০] আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোনোরকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাব! আমার তো এখনে আর কোনো ভয় নেই; আমি দোসরা এলাকায় ঘরের ঠ্যাকনা করিছি।

বাচ : (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কী বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ, হানিফ, অমন রাগলে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক।

হানি : আরে থোও ম্যানে, ঠাহুর! আমার লহু[২১] গরম হয়ে উঠতেছে, আর হাত দু'খানা যেন নিশপিশ কত্তেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিলয়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কী?

বাচ : না, তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস তবে আমি চল্যেম। (গমনোদ্যত)

হানি : আরে, রও না, ঠাহুর! এত গোসা হতেছ কেন? ভালো, কও দিনি, আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে[২২] তো শালারে শোধ দিতি পারব?

বাচ : হাঁ, তা পারবি বৈকি।

হানি : আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বলবে তাই করব এখনে।

বাচ : তবে চল, ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ)

ফতে : ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কী হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি : আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দু-কোশ পাঁচ-কোশ যেতে হবে না। তো, এইখেনে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততখন আসুন।

ফতে : ভাই, যে আঁদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমন কোরে থাকপো?

পুঁটি : (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছমছম করে, আবার শুনেছি এখানে নাকি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আহ্, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে : তুই নৈলে থাক ভাই, মুই আর রতি পারব না। (গমনোদ্যত।)

পুঁটি : (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর, ছুঁড়ি! আমি থাকলে কী হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশ্যে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এল বল্যে।

ফতে : না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদমি এ-কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্ত রাখপে না।

পুঁটি : আরে, মিছে ভয় করিস কেন? সে কেমন করে জানতে পারবে বল; সে কি আর এখানে দেখতে আসছে? তা এত ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কী একটা শব্দ হল না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ)

ফতে : (বিষণ্ন ভাবে) তুই যদি না ছাড়িস ভাই তবে আর কী করব; এখানে আল্লা যা করে! তা চল মোরা ঐ মসজিদের মদ্দি যাই; আবার এখানে কেটা কোন্ দিক হতে দেখতি পাবে।

পুঁটি : না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আহ্, এ বুড়ো ডেকরা মরেছে নাকি?

ফতে : (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ দেখি কে দু'জন আসচে, আমি ভাই ঐ মসজিদের মদ্দি নুকুই।

পুঁটি : না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখচি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আসচে। আহ্, বাঁচলেম।

ফতে : না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি : আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ)

পুঁটি : আহ্, কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যেন বলে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত : হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়্যে গেল কি? ছুঁড়ি রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোনার চাঙড়! (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিক কেউ না এসে পড়ে।

গদা : যে আজ্ঞে।

ভক্ত : ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখচি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরী, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কী?

গদা : (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত : আহা! এমন খোশ-চেহারা কি হানফের ঘরে সাজে? রাজরানী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

'ময়ূর চকোর শূক চাতকে না পায়।

হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥'

বিধুমুখী, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো !—আহ্ !

পুঁটি : (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা ! ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা ? (প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে ?

ভক্ত : আরে, তুই চুপ কর না কেন ?

পুঁটি : যে আজ্ঞে।

ফতে : পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল।

পুঁটি : আ মর, একশো বার ঐ কথা ? বাবু এত করে বলচ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না ? হাজার হোক নেড়ের জাত কি-না—কথায় বলে 'তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।' কত্তাবাবুকে পেলে কত বামুন কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ তো নস, তোদের জাত আছে, না ধম্ম আছে ? বরং ভাগ্যি করে মান যে বাবুর চোখে পড়েছিস।

ফতে : না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদমি আসে এখনি মোকে খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত : (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সী, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচব কিসে ?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চন্দো পুরুষ !

'তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভালো লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভালো আর সব কালো লো॥'[২৩]

তা দেখ ভাই, বুড়ো বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাকবে না।

গদা : (স্বগত) ভেলা মোর ধন রে ? এই তো বটে।

পুঁটি : কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই তো ভালো হয় ।

ভক্ত : (চিন্তিতভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে ?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন ছার ?

নেপথ্যে : (গম্ভীর স্বরে) বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার ? (সকলের ভয়।)

ভক্ত : (সত্রাসে চতুর্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ— আ-আ-আ-আমি না ! ও বাবা ! এ কী ? কোথা যাব !

পুঁটি : (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম ! আমি তখনি তো জানি—রাম—রাম—রাম !

ভক্ত : ও গদা ! কাছে আয় না।

গদা : (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—

(নেপথ্যে হুংকার-ধ্বনি)

পুঁটি : ই-ই-ই-ই ! (ভূতলে পতন ও মূর্ছা)

ভক্ত : রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম !—ও মা গো—কী হবে !

(নেপথ্যে)

এই দেখ না কী হয়?

ভক্ত : (করজোড় করিয়া সকাতরে) বাবা ! আমি কিছু জানিনে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত : আঁ—আঁ—আঁ !

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ— 'মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ী, এই তো বিচার বটে', এবং প্রবেশ।)

গদা : (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন ! আহ্ ! বাঁচলেম; বামুনের কাছে ভূত আসতে পায় না ! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা ! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ : এ কী ! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন? —হয়েছে কী? আঁ?

ভক্ত : (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচপোৎ দাদা নাকি? আহ্ ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কী? তুমি যে এসে পড়েছ, বড় ভালো হয়েছে।

পুঁটি : (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম !

গদা : ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ।

পুঁটি : (উঠিয়া) গিয়েছে? আহ্ রক্ষে হোলো। তা চল বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে ! (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা ! এই যে ভটচাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ : কত্তাবাবু, আমি এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন দেখি ব্যাপারটাই কী ! আপনিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখছি হানিফ গাজীর মাগ।

ভক্ত : (স্বগত) একদিকে বাঁচলেম, এখন আর-এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট ! করি কী? (প্রকাশে বিনীতভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হাঁ দেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বলচি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড়ো বয়সে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কী বলব।

বাচ : সে কী, কত্তাবাবু ! আপনি হলেন বড়মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন জোটা ভার; তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি?—

ভক্ত : হয়েছে—হয়েছে, ভাই ! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেব, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেব, কিন্তু এই কর্মটি কর্যো যেন আজকের কথাটা কোনোরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ : (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, কর্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বলতে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো একপ্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা

হল, তা আমার সে-কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কী?—তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজীর প্রবেশ)

হানি : কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত : (অতি ব্যাকুলভাবে) এ কী! অ্যাঁ। এ আবার কী সর্বনাশ উপস্থিত!

হানি : (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাশ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জানতি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপনারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজদি[২৪] নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত : (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেমনি তার বিধিমতো শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ-কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি : সে কী কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুশির কথা আর কী হতি পারে? তা এ-কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত : সর্বনাশ!—বলিস কী হানিফ? ও বাচপোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফকে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ : (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফকে একপার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন।)

ভক্ত : রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দু' ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কানে খত, এমন কর্মে আর নয়।

ফতে : (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু?—নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না?

ভক্ত : দূর হ, হতভাগী, তোর জন্যই তো আমার এই সর্বনাশ উপস্থিত।

ফতে : সে কী, কত্তাবাবু!—এই, মুই আপনার কলজে হচ্ছেলাম, আরো কী কী হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত : কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কর্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এততেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দভ আর নাই।

গদা : (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেশা উঠল!

পুঁটি : উঠুক বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাব। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলোর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ-কাজে হাত দি?

বাচ : (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফকে দুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত : দু-শ' টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনেপ্রাণে গেলেম। বাচপোৎ দাদা, কিছু কমজম কি হয় না?

বাচ : আজ্ঞে না, এর কমে কোনো মতেই হবে না।

ভক্ত : (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখলেম যে, এ কর্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করব। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম ফলল ধর্ম,
'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'॥

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন

উন্নয়ন কর্মসূচী
EQAEP

টিকা

১. *ওয়াকিফ হয়েচেন—অবগত আছেন।*

২ *ভারতচন্দ্র : বিদ্যাসুন্দর কাব্য (বিদ্যার রূপবর্ণনা)*

৩. *বিচে—মধ্যে।*

৪. *এনছাপ—ন্যায়বিচার।*

৫. *মকদুর—দুঃসাহস।*

৬. *কসবগিরি—বেশ্যাবৃত্তি।*

৭. *নসিব—অদৃষ্ট।*

৮. *জওয়ান—যুবক।*

৯. *খসম—স্বামী।*

১০. *মালুম—অনুভব করা, জানা।*

১১. *যা হৌক মেনে—যা হোক গে। মেয়েলি প্রয়োগ।*

১২ *ইয়াদ—খেয়াল।*

১৩. *সমঝে—বুঝে, বিবেচনা করে।*

১৪. *থোড়া—কিছু*

১৫. *বাৎচিত—কথাবার্তা*

১৬. *আদমি—মানুষ, এখানে স্বামী।*

১৭. *মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে বর্ণিত নারীরাজ্যের যুবতী অধীশ্বরী। পৌরাণিক উল্লেখটি কৌতুকরসের দিক থেকেই অনুধাবনযোগ্য ও আস্বাদ্য।*

১৮. *সংলাপে 'তবে' কথার ব্যবহার মধুসূদনের মুদ্রাদোষ। শর্মিষ্ঠায় খুবই বেশি ছিল। ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে।*

১৯. *খোসবু—গন্ধ।*

২০. *লেকিন—কিন্তু।*

২২ *আখেরে—ভবিষ্যতে, শেষ পর্যন্ত।*

২৩. *ভারতচন্দ্র : রসমঞ্জরী (স্বাধীনভার্যা-নায়ক)। মূল কবিতায় 'নিকটের স্থানে হৃদয়ে' পাঠ পাওয়া যায়।*

২৪. *তজদি—পরিশ্রম।*

একেই কি বলে সভ্যতা?

পুরুষ-চরিত্র	স্ত্রী-চরিত্র
কর্তা মহাশয়	গৃহিণী
নব বাবু	প্রসন্নময়ী
কালী বাবু	হরকামিনী
বাবাজী	নৃত্যকালী
বৈদ্যনাথ	কমলা
বাবুদল	পয়োধরী
সারজন	নিতম্বিনী (খেমটাওয়ালী)
চৌকিদার	বারবিলাসিনীদ্বয়।
যন্ত্রীগণ	
খানসামা	
বেহারা	
দরওয়া	
মালী	
বরফওয়ালা	
মুটিয়াদ্বয়	
মাতাল ইত্যাদি	

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ
নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু আসীন

কালী : বল কী?

নব : আর ভাই বলব কী। কর্তা এতদিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ি থেকে বেরনো ভার।

কালী : কী সর্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কী?

নব : আর উপায় কী? সভাটা দেখচি এবলিশ কত্ত্যে হল।

কালী : বাহ্, তুমি পাগল হলে নাকি? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ কর‍্যে থাকে? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের সবস্ক্রিপশন লিস্ট অতি পুওর ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলেম, এখন—

নব : আরে ওসব কি আমি আর জানি নে যে, তুমি আমাকে আবার নতুন করে বলতে এলে? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠয়ে দিতে চাচ্চি? কিন্তু করি কী? কর্তা এখন কেমন হয়েচেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়িছাড়া হই, তা হলে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেন্ড দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

কালী : কী উৎপাত! তোমার কথা শুনে ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুখিয়ে উঠল। ওহে নব, বলি কিছু আছে?

নব : হুষ। অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্রান্ডি আছে।

কালী : (সহর্ষে) জাস্ট দি থিং। তা আনো না দেখি।

নব : রসো দেখচি। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) কর্তা বোধ করি এখনো বাড়ির ভিতর থেকে বেরোন নি। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে বোদে।

নেপথ্যে : আজ্ঞে যাই।

কালী : আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাহ্, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্ত্যে এল? এই নব আমাদের সর্দার, আর মনি ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্বনাশ হবে তার সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ)

নব : কর্তা কোথায় রে?

বৈদ্য : আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ির ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব : তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাস শীঘ্র করে আন তো।

[বোদের প্রস্থান]

কালী : ভালো নব, তোমাদের কর্তা কি খুব বৈষ্ণব হে?

নব : (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কলকাতায় আর এমন ভক্ত দুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ)

কালী : এদিকে দে।

নব : শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোনার লঙ্কাও নাই।

কালী : না থাকল তো বয়ে গেল কি ! এ তো আছে? (বোতল প্রদর্শন) হা, হা, হা ! (মদপান।)

নব : আরে করো কী, আবার?

কালী : রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন জমাতে কসুর করে?[১] হা, হা, হা ! (পুনর্মদপান।)

নব : (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাসটা নিয়ে যা, আর শিগগির গোটাকতক পান নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান]

কালী : এখন চল ভাই, তোমাদের কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাগগে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন শালা ছেড়ে যাবে।

নব : তোমার পায়ে পড়ি, ভাই একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ)

কালী : দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে : ও বৈদ্যনাথ—

[বোদের প্রস্থান]

নব : এই যে কর্তা বাইরে আসচেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী : আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্তো চাই। সে যা হউক তবে চল না, কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব : (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর অত ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্তা তোমার গাড়ি দরোজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী : বল কী? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রান্ডি দিতে বল তো; আমার গলাটা আবার যেন শুখিয়ে উঠছে।

নব : কী সর্বনাশ ! এমনিই দেখছি তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে?

কালী : আচ্ছা, তবে থাকুক। ভালো, কর্তা এখানে এলে কী বলব বল দেখি?

নব : আর বলবে কী? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী : কী পরিচয় দেব বল দেখি, ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা !

নব : আহ্ মিছে তামাশা ছেড়ে দেও, এখন সত্যি কী বলবে বল দেখি? এক কর্ম কর, কোনো একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী : তা পারব না কেন? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব : না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরানহাটার কোন ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে? —ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত?

কালী : আমি ভাই গরানহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব : কোন প্যারী হে?

কালী : আরে, গোদা প্যারী। সে কী! তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়িতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম তার আর কী বলব। সে যাক, এখন কী বলব তাই ঠাওরাও।

নব : (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন ।

কালী : হাঁ, একটা ওলড ফুল ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব : তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী : হা, হা, হা!

নব : দূর পাগল, হাসিস কেন?

কালী : হা, হা, হা! ভালো তা যেন হল, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই-একখানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব : তবেই যে সারলে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগবদগীতা —গীতগোবিন্দ—

কালী : গীত কী?

নব : জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী : ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর —বিন্দা দূতীর গীত—

নব : হা, হা, হা! ভায়ার কী চমৎকার মেমরি।

কালী : কেন, কেন?

নব : হুষ! কর্তা আসছেন। দেখ ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

(কর্তা মহাশয়ের প্রবেশ)

কালী : (প্রণাম।)

কর্তা : চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কী?

কালী : আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ।—মহাশয়, আপনি—কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জানতেন। আমি তাঁরি ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্তা : কোন কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ?

কালী : আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্তা : হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী : আজ্ঞে হাঁ।

কর্তা : বেঁচে থাক, বাপু। বস (সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কী কর, বাপু?

কালী : আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে।

কর্তা : বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়ামহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান?

কালী : আজ্ঞে?

কর্তা : (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি-না?

কালী : জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্তা : কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে?

কালী : আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটিং হবে।

কর্তা : কী সভা বললে বাপু?

কালী : আজ্ঞে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্তা : সে সভায় কী হয়?

কালী : আজ্ঞে আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজি চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্তা : তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি-না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী : আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্তা : ভালো, বাপু, তোমরা কোন সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি!

কালী : (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লে। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপদেবের বিন্দা দূতী।

কর্তা : কী বল্লে বাপু?

নব : আজ্ঞে, উনি বলছেন শ্রীমদ্ভগবদগীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্তা : জয়দেব? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী : জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্তা : কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজেনি, তা তোমরা বাপু, এত সকালে যাবে কেন?

কালী : আজ্ঞে, আমরা সকাল-সকাল কর্ম নির্বাহ করব বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মিট করি।

কর্তা : তোমাদের সভাটা কোথায়, বাপু?

কালী : আজ্ঞে, সিকদার পাড়ার গলিতে।

কর্তা : আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী : আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান]

কর্তা : (স্বগত) এই কলিকাতা শহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলেটিকে কি একলা পাঠিয়ে ভালো কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠিয়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কী? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে, নবকে যেতে দিয়ে ভালো করি নাই।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিকদার পাড়া স্ট্রিট
বাবাজীর প্রবেশ

বাবাজী : (স্বগত) এই তো সিকদার পাড়ার গলি, তা কই? নববাবুর সভাভবন কই? রাধে কৃষ্ণ। (পরিক্রমণ) তা দেখি, এই বাড়িটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত।)

নেপথ্যে : তুমি কে গা? কাকে খুঁজচো গা?

বাবাজী : ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ি?

নেপথ্যে : ও পুঁটি দেকতো লা, কোন বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী : (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এতদিনের পর কি মাতাল হলেম!

নেপথ্যে : তুই বেটা কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেব।

বাবাজী : (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কী আপদ! রাধে কৃষ্ণ! কর্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ কর্মে পাঠালেন? (পরিক্রমণ) এই দেখচি একজন ভদ্রলোক এদিকে আসচে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে!

(একজন মাতালের প্রবেশ)

মাতাল : (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্চে গা?

বাবাজী : তা বাবু, আমি কেমন করে বলব?

মাতাল : সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ?

বাবাজী : রাধে কৃষ্ণ!

মাতাল : তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস কী? হাহ্ শালা।

[প্রস্থান]

বাবাজী : কী সর্বনাশ! বেটা কী পাষণ্ড গা? রাধে কৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোনো ভদ্রলোক বসতি করে গা?—এ আবার কী? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে? —হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন।)

(দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ)

প্রথম : ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখলি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল?

দ্বিতীয় : তবে বুঝি আস্তে আস্তে পদীর বাড়িতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কত্তুম।

প্রথম : দাঁড়া না, বাড়ি যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়ব। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার নাকের জলে চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল না, আগে মদনমোহন দেখে আসি; এসে ওর শ্রাদ্ধ করব এখন।

দ্বিতীয় : তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা কী—ও থাকি, ঐ মোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়য়ে রয়েছে, দেখ!

প্রথম : হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিনসের রকম দেখ না—যেন তুলসীবনের বাঘ।

বাবাজী : (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বলতে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা?

দ্বিতীয় : তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য।) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি?

প্রথম : আহা, বাবাজী, তোমার কি বষ্টুমী হারয়েচে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কী হবে? যা হবার তা হয়েচে, কী করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?

দ্বিতীয় : কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলিই পারি। কী বল, বাবাজী।

প্রথম : বাবাজী আর বলবেন কী? চল আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী : (স্বগত) কী বিপদ! রাধে কৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট হয়েছে।

দ্বিতীয় : হ্যেঁ, আমরা যাব বৈকি! তোমার তো সেই তরঙ্গিণী বৈ আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে কাঁদো। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) 'সাধের বষ্টুমী প্রাণ হারয়েছে আমার।'

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান]

বাবাজী : আহ্, কী উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কী? লাভের মধ্যে কেবল আমারই যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কী? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হ্যেঁ, ভালো হয়েচে, এই একটা মুশকিলআসান আসচে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে[২] বেরয়েচে দেখচি; এখানে চুপ করে দাঁড়য়ে থাকলে কী জানি যদি চোর বল্যে ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভালো, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়ল। (বেগে পলায়ন।)

(সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ)

সার : হাল্লো! চওকিডার! এক আডমি ওঢার ডৌড়কে গিয়া নেই?

চৌকি : নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা।

সার : আলবট গিয়া, হাম ডেকা! টোম জলডি ডওড়কে যাও, উস্টরফ ডেকো, যাও—যাও—জলডি যাও, ইউ সুওর।

চৌকি : (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) কোন হেয় রে, খাড়া রও।

সার : ড্যাম ইওর আইজ—ইঢার, ইউ ফুল।

চৌকি : (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর (বেগে প্রস্থান।)

সার : (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন ক্যেচ হিম—

নেপথ্যে : (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো পাকড়ো—উহুহুহুহু—

নেপথ্যে : আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে : শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গীয়া।[৩]

নেপথ্যে : উহুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

(বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ)

সার : আ ইউ, টোম চোট্টা হেয়?

বাবাজী : (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে—

সার : হ্যেং ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে—চুপরাও, ইউ ব্লডি নিগর, ডেকলাও টোমারা ব্যেগ মে কিয়া হেয়। (বলপূর্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ, —হাম বড়া হিণ্ডু হুয়া —রাঢ়ে, কিস ডে! হা, হা, হা!

বাবাজী : (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত।)

চৌকি : খাড়া রও, শালা।

বাবাজী : দোহাই কোম্পানির —দোহাই কোম্পানির।

সার : হোলড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক ব্রুট। ইয়েহ ব্যেগমে আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। (ঝুলি বলপূর্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার : দেটস রাইট! ইউ সূটি ডেভল। কেস্কা চোরি কিয়া? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী : দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্মাবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার : সো নেই হোগা, টোম ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম যাগে নেই? আলবট যানে হোগা।

চৌকি : চলবে, থানেমে চল।

বাবাজী : দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার : (হাস্যমুখে) কিয়া? টোম নেই মাংটা! (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল দেন, হাম ডেকটা ওস্কা কুচ কসুর নেই,[৪] ওস্কো ছোড় ডেও।

বাবাজী : (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি : (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম হামকো তো কুচ দিয়া নেহি[৫]—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী : না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকি : হাঁ হাঁ, ঐ বাড়িমে—ও বড়া মজাকি জাগগা হেয়।

সার : ডেকো চোকিডার, রোপেয়াকা বাট —(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান।)

চৌকি : জো হুকুম, খাবিন।

সার : মম! ইজ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান]

বাবাজী : রাধে কৃষ্ণ! আহ্ বাঁচলেম; আজ কী কুলগ্নেই বাড়ি থেকে বেরয়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন বেটারও হাতাপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাকতে হতো, না কী হতো, কিছু বলা যায় না।

(হোটেল বাক্স লইয়া দুইজন মুটিয়ার প্রবেশ)

এ আবার কী? রাধে কৃষ্ণ—কী দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কী আনছে? (অন্তে অবস্থিতি।)

প্রথম : ইহ্ আজ যে কত চিজ পেটিয়েচে[৬] তার হিসাব নাই, মোর গরদানটা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয় : দেখ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। বেটারগো কী আরামের দিন, ভাই।

প্রথম : মর বেকুফ[৭] ও হারামখোর বেটারগো কি আর দিন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা।

দ্বিতীয় : লেফিন ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই[৮] মোগর পোঁচঘর[৯] এত ফেঁপে ওটতেচে; সাম[১০] হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বলতি পারে।

প্রথম : ও কাদের মেয়াঁ, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে? দরওয়ানজীকে ডাকো না। ও দরওয়ানজী! এ মাড়ুয়াবাদী শালা গেল কোহানে?—ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী!

নেপথ্যে : কোন হেয় রে।

প্রথম : মোরা পোঁচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে : আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়াগণের প্রস্থান]

বাবাজী : (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কী আশ্চর্য! এসব কিসের বাক্স? উহ্, থু, থু, রাধে কৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে : বেলফুল।

নেপথ্যে : চাই বরোফ। [মালী এবং বরফওয়ালার প্রবেশ]

মালী : বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে।

নেপথ্যে : না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।

বরফ : চাই বরফ—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে : তোম্বি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফওয়ালার প্রস্থান]

বাবাজী : (স্বগত) কী সর্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে দূরে : বেলফুল—চাই বরফ!

(যন্ত্রীগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ)

নিত : কাল যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্র্যেন্ডি খাইয়েছিল—উহ্, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচব তাই ভাবচি।

পয়ো : আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। আজকাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী : চল, ভিতরে যাওয়া যাউক। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে : কোন হ্যায়?

পয়ো : বলি আগে দুয়র খোলো, তার পরে কোন হ্যায় দেখতে পাবে এখন।

নেপথ্যে : ওহ্ আপলোক হ্যায়, আইয়ে।

[যন্ত্রীগণ ইত্যাদির প্রস্থান]

বাবাজী : (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কী চমৎকার ব্যাপার! এরা তো কশবী[১১] দেখতে পাচ্চি। কী সর্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্চি কাণ্ডটা কী। নবকুমারটা দেখচি একবারে বয়ে গেছে। কর্তা মহাশয় এসব কথা শুনলে কি আর রক্ষে থাকবে?

(নববাবু এবং কালীবাবুর প্রবেশ)

নব : হা, হা, হা—শ্রীমতী ভগবতীর গীত ! তোমার ভাই কী চমৎকার মেমরি ! হা, হা, হা।

কালী : আরে ওসব লক্ষ্মীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাকবে।

নব : (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কী, এ যে বাবাজী হে ! কেমন ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি–না যে কর্তা একজন–না–একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হৌক, একে যে আমরা দেখতে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বলতে হবে।

কালী : বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাটলেট কি মটন চপ খাইয়ে দি—শালার জন্মটা সার্থক হউক।

নব : চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া) কিগো, বাবাজী যে? তা আপনি এখানে কী মনে করে?

বাবাজী : না, এমন কিছু না, তবে কি–না একটা কর্মবশত এই দিগ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব : বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী : (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস কী, পাগল? এটাকে এর ভিতরে নে গেলে কী হবে? আমরা তো আর হরিবাসর কত্যে যাচ্চি নে।

নব : (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আহ্, চুপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভালো হয় না।

বাবাজী : না বাবু, আমার অন্যত্তরে কর্ম আছে, তোমরা যাও।

[প্রস্থান]

কালী : বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না–হয় ঘা দুই লাগিয়ে দি।

নব : দরওয়ান—

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা : মহারাজ।

নব : ও লোগ সব আয়া?

দৌবা : জি, মহারাজ।

নব : আচ্ছা, তোম যাও।

দৌবা : জো হুকুম, মহারাজ। [প্রস্থান]

নব : আজ ভাই দেখচি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেঙ্গাম করে বসবে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগিদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।

কালী : পুঃ, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড হে ! তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল ।

নব : না হে না, তুমি ভাই এসব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও কর্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কত্ত্যে পারি।

কালী : ননসেনস ! তার চেয়ে শালাকে গোটাকতক কিক দিয়ে একবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম দি ব্রুট ! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোনো মিশন আছে?

নব : দূর পাগল, এসব ছেলেমানুষের কর্ম নয়। চল, আমরা দু'জনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভা

কতিপয় বাবুর প্রবেশ

চৈতন : নব আর কালী যে আজ এত দেরি করছে এর কারণ কী?

বলাই : আমি তা কেমন করে বলব? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্মেই লিড নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে বুঝি আর কোনো কর্মই হবে না।

শিবু : যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দু'জনে লেখাপড়া বেশ জানে।

বলাই : বিটুইন আওয়ারসেলবস, এমন কী জানে?

মহেশ : হা, হা, সকলেরী বিদ্যা জানা আছে! সেদিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছ, তাতে লিন্ডলি মরের[১২] যে দুর্দশা তা তো মনে আছে?

বলাই : এতেও আবার প্রাইডটুকু দেখেছ? কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেস।

চৈতন : আহ্, তারা ফ্রেন্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কী? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চলছে—তা জান?

মহেশ : তা টুরুথ বলব তার আর ফ্রেন্ড কী?

বলাই : আচ্ছা, সে কথা যাউক; আমরাও তো মেম্বর বটে, তবে তাদের দু'জনের জন্যে আমাদের ওএট করবার আবশ্যক কী?

শিবু : তাই তো। আমাদের তো কোরম[১৩] হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম আরম্ভ করা যাউক না কেন?

মহেশ : হিয়র, হিয়র, আমি এ মোসন সেকেন্ড করি।

বলাই : হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অবজেকশন নাই, একবার নেম কন[১৪] —ব্রাভো! হা, হা, হা।

মহেশ : (ঘড়ি দেখিয়া) ন'টা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকি আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এল না, তা আমি চৈতনবাবুকে চ্যারম্যান প্রোপোজ করি।

সকলে : হিয়র, হিয়র!

চৈতন : (গাত্রোত্থান করিয়া) জেন্টেলমেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম আমি যতদূর পারি প্রাণপণে চালাতে কসুর করব না,—নাউ টু বিজনেস।

সকলে : হিয়র, হিয়র! (করতালি)

চৈতন : (উচ্চৈঃস্বরে) খানসামা—বেয়ারা—

নেপথ্যে : জি, আজ্ঞে।

চৈতন : গোটা দুই ব্রান্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছা হয় তো বল।

বলাই : এমন সময়ে কোন শালা বিয়ার খায়।

সকলে : হিয়র হিয়র।

(খানসামা এবং বেয়ারার মদ এবং তামাক লইয়া প্রবেশ)

চৈতন : সব বাবু লোককো সরাব দেও, (সকলের মদপান) আর বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর দেও।

খান : আচ্ছা বাবু।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান]

চৈতন : বেয়ারা—ঐ খেমটাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ, খানিকটে বরফ আন।

বেয়ারা : যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

বলাই : আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেলথ দিতে চাই।

সকলে : হিয়ার, হিয়ার (মদপান করিয়া) হিপ, হিপ, হুররে, হুররে।

(নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রীগণের প্রবেশ)

চৈতন : আরে এস, বস ! কেমন ভাই, চিনতে পার ? তবে ভালো আছ তো ?

(সকলের উপবেশন)

নিত : যেমন রেখেছেন।

চৈতন : আমি আর তোমাকে রেখেছি কই ? আমার কি তেমন কপাল ?

সকলে : ব্রাভো, হিয়ার (করতালি)।

চৈতন : ও পয়োধরী, একটু এদিকে সরে বস না।

পয়ো : না, আমি বেশ আছি।

চৈতন : (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাইবাবু, এঁদের একটু কিছু খাওয়াও না।

বলাই : এই এস (সকলের মদপান)।

শিবু : (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস নাকি ?

মহেশ : (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমব কেন ?—নব আসেনি বটে ?

সকলে : (হাস্য করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন : (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো : এর পর হলে ভালো হয় না ?

চৈতন : না না, পরে আবার কেন ? শুভ কর্মে বিলম্বে কাজ কী।

পয়ো : আচ্ছা তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড়খেমটা।

গীত

রাগিণী শঙ্করা, তাল খেমটা
এখন কি আর নাগর তোমার
আমার প্রতি, তেমন আছে।
নূতন পেয়ে পুরাতনে
তোমার সে যতন গিয়েছে॥
তখনকার ভাব থাকত যদি,
তোমায় পেতেম নিরবধি,
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম হয়েছে।
যা হবার আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন নতুনে মন মজেছে॥

সকলে : কিয়াবাৎ, শাবাশ, বেঁচে থাক বাবা, জিতা রও বাবা।

চৈতন : ও বলাইবাবু, তুমি কেমন সাকি হে?

বলাই : সাকি আবার কী?

চৈতন : যে মদ দেয় তাকে পারসিতে সাকি বলে।

শিবু : (গাইয়া) 'গর ইয়ার নহো সাকি'। —তা, এস (সকলের মদপান)।

চৈতন : চুপ কর তো, কে যেন উপরে আসছে না?

বলাই : বোধ করি নব আর কালী—

(নব এবং কালীর প্রবেশ)

সকলে : (সকলে গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ হিপ হুররে।

কালী : (প্রমত্তভাবে) হুররে, হুররে।

নব : বস, ভাই, সকলে বস, (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের একসকিউজ কত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।

শিবু : (প্রমত্তভাবে) দ্যাটস এ লাই।

নব : (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট, তুমি আমাকে লাইয়র বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট করব?

চৈতন : (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাহ্, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লিং কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন?

নব : ট্রাইফ্লিং!—ও আমাকে লাইয়র বললে—আবার ট্রাইফ্লিং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন? তাতে কোন শালা রাগত? কিন্তু —লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়!

চৈতন : আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেন্‌শন করো না। (উপবেশন করিয়া)

নব : কিগো পয়োধরী, নিতম্বিনী, তোমরা ভালো আছ তো?

পয়ো : হ্যাঁ, আমরা তো আছি ভালো, কিন্তু তোমায় যে বড় ভালো দেখচি নে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব : আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হব—ওহে বলাই, একটু ব্র্যান্ডি দেও তো।

সকলে : ওহে আমাদের ভুলো না হে। (সকলের মদপান)

নব : ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচ।

কালী : আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক হয়েচি। শালা এদিকে মালা ঠকঠক করে, আবার ঘুস খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কী হিপোক্রিট।

নব : মরুক, সে থাক। ও পয়োধরী তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।

সকলে : না, না, আগে তোমার ইসপিচ।

নব : (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা; জেন্টেলম্যেন, আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখচেন, এই সকল একত্র করে পড়লে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা' পাওয়া যায়।

সকলে : হিয়ার, হিয়ার।

নব : জেন্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মিট কর্য্যে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি— অ্যান্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ।

সকলে : হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ।

নব : জেন্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরস্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসিয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে : হিয়ার, হিয়ার।

নব : জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাত-ভেদ তফাত কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্যদেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়!

সকলে : হিয়ার, হিয়ার।

নব : কিন্তু জেন্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুশি, সে তাই কর। জেন্টেলম্যেন, ইন দি নেম অব ফ্রিডম, লেট অস এঞ্জয় আওয়ারসেলবস। (উপবেশন।)

সকলে : হিয়ার, হিয়ার,—হিপ, হিপ, হুররে হুর—রে; লিবরটি হল—বি ফ্রি—লেট অস এঞ্জয় আওরসেলবস।

নব : ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই : আচ্ছা,—এই এস (সকলের মদপান)

নব : তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম, ওপেন দি বল মাই বিউটিস।

পয়ো : নৃত্য এবং গীত।

নব : কিয়াবাৎ, জীতা রও। বেঁচে থাক ভাই।

কালী : হুররে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর।

সকলে : জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর (করতালি)।

নব : চল ভাই, এখন সপর টেবিলে যাওয়া যাউক।

চৈতন : (গাত্রোত্থান করিয়া)—থ্রি চিয়ার্স ফর আমাদের চ্যারম্যান—

সকলে : হিপ, হিপ, হিপ—হুররে! হুর—রে—হুররে।

নব : ও পয়োধরী তুমি ভাই, আমার আরম নেও।

পয়ো : তোমার কী নেব, ভাই?

নব : এস, আমার হাত ধর।

কালী : ও নিতম্বিনী, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর কর। আহা! কী সফট হাত!

সকলে : ব্রাভো। (করতালি)

[যন্ত্রীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

তবলা : ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না।

বেহালা : কই, দেখি? হ্যাঁ, আছে। এই নেও (উভয়ে মদপান)।

তবলা : আহ্, খাসা মাল যে হে।

নেপথ্যে : হিপ, হিপ, হুররে।

বেহালা : চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্রান্ডিতে আমাদের সানে না।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির
প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং
হরকামিনী আসীন

প্রসন্ন : এই নেও—
নৃত্য : কি খেললে ভাই?
প্রসন্ন : চিড়িতনের দহলা।
নৃত্য : আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, ক্রুপ খেললি কেন?
প্রসন্ন : তুই, ভাই, মিছে বকিস কেন? হাতে রঙ না থাকে পাস দে যা।
নৃত্য : এই এস, আমি টেক্কা মারলেম।
হর : এই নেও।
নৃত্য : ও কী ও, পাস দিলে যে?
হর : হাতে ত্রুপ না থাকলে পাস দোবো না তো কী করব।
নৃত্য : এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।
কমলা : আমি ভাই বিবি দিলাম।
নৃত্য : মর, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন?
কমলা : বাহ্ বিবি দেব না তো কী? সায়েব কোথা?
নৃত্য : এই যে সায়েব আমার হাতে রয়েছে—
কমলা : আমি তো ভাই আর জান নই।
নৃত্য : মর ছুঁড়ি, খেলার ইশারায় বুঝতে পারিস নে? তোর মোতন বোকা মেয়ে তো আর দুটি নাই লা, তুই যদি তাস না খেলতে পারিস তবে খেলতে আসিস কেন?
কমলা : কেন, খেলতে পারব না কেন?
নৃত্য : একে কি কেউ খেলা বলে? তুই আমার টেক্কার ওপর বিবি দিলি।
কমলা : কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভালো হতো?
হর : আর ভাই, মিছে গোল করিস কেন?
নৃত্য : (কমলার প্রতি) কী আপদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কী?
কমলা : বস, তুই পাগল হলি নাকি লো? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা?
নৃত্য : তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস তবে অবিশ্যি টের পেতিস।
কমলা : ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয়? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে?
নেপথ্যে : ও প্রসন্ন—
প্রসন্ন : চুপ কর লো, চুপ কর, ঐ শোন, মা ডাকচেন—
নেপথ্যে : ও বউ—
প্রসন্ন : (উচ্চৈঃস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে : ওলো, তোরা ওখানে কী করচিস লা।

প্রসন্ন : (উচ্চৈঃস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর : ও ঠাকুরঝি, তাসজোড়াটা ভাই, নুকোও, ঠাকুরুন দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন : (তাস বালিশের নিচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়তে থাকি; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য : আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা : আরে তাতে বয়ে গেল কী? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না?

হর : তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর, ঐ দেখ ঠাকুরুন উপরে আসচেন। ধর, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর।

(গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী : ওলো, তোরা এখানে কী করচিস লা।

প্রসন্ন : এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চ্যি।

গৃহিণী : ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি-না।

নৃত্য : কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন?

গৃহিণী : আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েচিস। ভাগ্যে আজ নব বাড়ি নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসত।

প্রসন্ন : হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা?

গৃহিণী : ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—?

কমলা : ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন?

হর : (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে! ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারি আহ্লাদের দিন! দেখ, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেইরকম রঙ্গ বাধায়!

গৃহিণী : বউমা কী বলছে, প্রসন্ন?

নেপথ্যে : ও বেমোল, মা ঠাকরুন কোথায় গো? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী : তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নিচে আয়।

[প্রস্থান]

হর : (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝি! বল না রে, সেদিন তোর ভাই কী করেছিল?

প্রসন্ন : আহ্, ছি।

নৃত্য : কেন, কেন, কী করেছিল? বল না কেন, ভাই?

হর : (সহাস্য বদনে) বল না ঠাকুরঝি!

প্রসন্ন : না ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস, তবে এই আমি চললেম।

নৃত্য : কেন? বল্ না কী হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল।

হর : তবে বলব? সেদিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্য ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন? এতে দোষ কী? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?

প্রসন্ন : ছিঃ, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য : ও মা, ছি! ইংরিজি পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

হর : আরও শোন না, আবার বাবু বলেন কী?

প্রসন্ন : তোর দাদা মদ খেয়ে কী করে লো?

হর : কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন? আমি নাহয় বাপের বাড়ি গিয়ে থাকি; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন : হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক।

নেপথ্যে : ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে : তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচয়ে কথা কয়ো না, কত্তামশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্চেন।

নেপথ্যে : ডেম কত্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি?

কমলা : ঐ যে ছোটদাদা আসচেন।

নৃত্য : আয়, ভাই, আমরা লুকয়ে একটু তামাশা দেখি।

হর : (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভালো লাগে না। আহ্, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে্য বেরোবে এখন, আর এমন নাক ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুনলে জেগে ওঠে! ছিঃ!

কমলা : আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি)

(নববাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ)

নব : (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো—তোকে আমি রিফরম কত্যে চাই। তুই বুঝলি?

বৈদ্য : যে আজ্ঞে।

নব : বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রান্ডি ল্যাও।

বৈদ্য : যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্রান্ডি এনে দিচ্ছি! (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কর্তা এঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকি রাখবেন।

নব : (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্রান্ডি ল্যাও—জলদি।

বৈদ্য : আজ্ঞে, এই যাই। [প্রস্থান]

নব : (স্বগত) ড্যাম কর্তা—ওলড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কত্তে পারব না । বুড়ো একবার চোখ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেলফ? (উচ্চৈঃস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর : (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কী সর্বনাশ ! ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন : (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কী?

হর : ঐ দেখচিস, কর্তা ঠাকরুনের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন : তা আমি কী করব?

হর : তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ করতে বল্ না।

প্রসন্ন : (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারব না।

হর : (সহাস্য বদনে) আহ্ তায় দোষ কী? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি? যা না লা।

নব : ল্যাও—মদ ল্যাও!

হর : ও মা ! কী সর্ব্বনাশ ! (অগ্রসর হইয়া) কর কী ? কর্তা বাড়ির ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান ?

নব : (সচকিতে) এ কী ! পয়োধরী যে ? আরে এস, এস। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালোবাস, যে এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এস, এস (গাত্রোত্থান)

হর : ও ঠাকুরঝি, কী বকচে বুঝতে পারিস ভাই ?

প্রসন্ন : (সহাস্য বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কী বুঝব ?

নব : (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এস ভাই, আমি তোমার ডেমড স্লেভ। এস (ভূতলে পতন।)

(হর প্রসন্ন ইত্যাদি অগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কী হল ? (ক্রন্দন)

নেপথ্যে : কেন, কেন, কী হয়েছে ?

(গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ)

গৃহিণী : (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কী, এ কী ? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে ? ও মা, কী হল ? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ও মা, আমার কী হল ! ও মা, আমার কী হল ! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন তো লা। (প্রসন্নের প্রস্থান)। ও মা, ও মা, আমার কী হল ! (ক্রন্দন)

নৃত্য : উহ্ জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী : উহ্, ছিঃ ! তাই তো লো। ও মা, এ কী সর্বনাশ ! আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষটিষ খাইয়ে দিয়েছে নাকি ? ও মা, আমার কী হবে ! (ক্রন্দন।)

(প্রসন্নের সহিত কর্তার প্রবেশ)

কর্তা : এ কী !

গৃহিণী : এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ও মা, আমার কী হবে !

কর্তা : (অবলোকন করিয়া সরোষে) কী সর্বনাশ, রাধে কৃষ্ণ ! হা দুরাচার ! হা নরাধম ! হা কুলাঙ্গার !

গৃহিণী : (সরোষে) এ কী ? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় নাকি ? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন কর্য়ে বকচ কেন ?

কর্তা : (সরোষে) সোনার নব ! হ্যাঁ ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি ?

নব : হিয়র, হিয়র, হুররে।

গৃহিণী : ও মা, আবার কী হল ! এমন এলোমেলো বকচে কেন ? ও মা, ছেলেটিকে তো ভূতে-টুতে পায়নি।

কর্তা : তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ? তুমি কি দেখতে পাচ্চ না যে লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে ?

নব : হিয়র, হিয়র।

কর্তা : (সরোষে) চুপ, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই ?

নব : ড্যাম লজ্জা, মদ ল্যাও।

কর্তা : শুনলে তো ?

গৃহিণী : ও মা, আমার এ দুধের বাছাকে এসব কে শেখালে গা ?

কর্তা : আর শেখাবে কে? এ কলকাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোনো ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী : ও মা, তাই তো, এত কে জানে, মা?

কর্তা : কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করব! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক—

নব : হিয়র, হিয়র, আই সেকেন্ড দি রেজলুশন—

কর্তা : হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল!

গৃহিণী : ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান]

হর : (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ। হায়, এই কলকেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা তুমি আমাদের ওপর এত বাম হলে কেন?

প্রসন্ন : তা এ আজ আর নতুন দেখিলি নাকি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এইরকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর : তা বই আর কী, ভাই? আজকাল কলকেতায় যাঁরা লেখাপড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভালো জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলেই-বা কী আর না থাকলেই-বা কী। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কী ভাই, এইসব দেখেশুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কী যে, আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?

যবনিকা পতন

টিকা :

১ *বুদ্ধিমান সেনাপতি তার দুর্গে রসদ সংগ্রহ করে রাখে। কালীনাথও পাকস্থলীতে যথাসাধ্য মদ সংগ্রহ করে রাখতে চায়।*

২ *রোঁদ ফেরা—পাহারা দিয়ে পরিক্রমণ করা।*

৩. *তোমার জন্য ছুটে আমার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে।*

৪. *আমি দেখছি এর কোনো দোষ নেই।*

৫. *তুমি আমাকে তো কিছু দিলে না।*

৬. *পেটিয়েচে—পাঠিয়েছে।*

৭ *বেকুফ—বোকা।*

৮. *দৌলতেই—সম্পদে, এখানে কৃপায়।*

৯. *পোঁচঘর—খাদ্যের জন্য পশু বধের কেন্দ্র বা জবাইখানা।*

১০. *সাম—সন্ধ্যা।*

১১. *কশবী—বেশ্যা।*

১২ *লিণ্ডলি মর—ইংরেজ ব্যাকরণবিদ।*

১৩. *কোরম—সভা আরম্ভ করবার মতো প্রয়োজনীয় সভ্যসংখ্যার উপস্থিতি।*

১৪. *নেম কন—সকলের সম্মতি আছে।*

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সেকায়েপ
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।
বিক্রির জন্য নয়